শ্রীচৈতন্যের মহানুভাবে মীরা

শ্রীশ্রীমা সর্বানী

শ্রীশ্রীহরি এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাবলে জগৎ বিখ্যাত ও বন্দনীয়া দেবী মীরাবাঈ-এর পরিচয় নূতন করিয়া দিবার মত কিছু নাই। স্বমহিমায় তিনি এই ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে কৃষ্ণভক্তিপ্রেমের নির্যাসে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। মহাত্মা মীরাবাঈ সমগ্র নারীজাতির মহাগৌরব। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীগিরিধারীলালের একনিষ্ঠ সেবিকা। তাঁর ভক্তিরসসিক্ত হৃদয়ের ভজন সঙ্গীতের প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্ত পূর্ণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশকেও মোহিত করিয়াছে।

আদি ভক্তমাল গ্রন্থকার শ্রীনাভ স্বামী দেবী মীরাবাঈ-এর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

“সদৃশ গোপীন্ প্রেম প্রকট কলিযুগ হী দিখায়ো।
নির-অংকুশ অতি নিডর রসিক যশ রসনা গায়ো ॥
দুষ্টন্ দোষ বিচারি মৃত্যুকো উদ্যম কিয়ো।
বারণ বাঁকো ভয়ো গরল অমৃত জ্যোঁ পীয়ো ॥
ভক্তি নিশান বজাইকে কাহুতে নহি লজি।
লোক লাজ কুল শৃঙ্খলা ত্যজি মীরা গিরিধরলাল ভজি ॥”—

অর্থাৎ, পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময় এই ঘোর কলিকালেতেই অতি সুদুর্লভ গোপীর ন্যায় প্রেম মীরাবাঈ জগতে দেখিয়েছেন। এই রকমের গোপীপ্রেমই গৌড়ীয় আচার্য শিরোমণি শ্রীমৎ রূপগোস্বামীর রাগানুগা ভক্তি [রতি বা ভাব] শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ [ছয় গোস্বামী প্রভৃতির] গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ।

দেবী মীরাবাঈ কৃষ্ণপ্রেম রসে নিজে ডুবিয়া নির্ভয়ে সর্বোত্তম মধুররস ভাবাশ্রিত জনের গুণ কীর্তন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে অভক্ত দুর্জন ব্যাভিচারিণী মনে করিয়া প্রাণে মারিয়া ফেলিবার জন্যে অনেক উদ্যোগ করা হয়। কিন্তু দেবী মীরাবাঈ একটুও ভীত হন নাই। মহাবিষকে তিনি অমৃতের মতই স্বানন্দে পান করিয়াছিলেন। শ্রীহরিভক্তি বিজয় পতাকা উড়াইয়া, প্রেমপ্রীতি ভক্তির জয়ঢাক বাজাইয়া, নিঃসম্ভ্রমে লোকলজ্জা এবং উজ্জ্বল রাজমর্য্যাদা মান-অপমান পরিত্যাগ করিয়া মীরাবাঈ “মধুর ভাবে” মহাভাবে আপ্লুত হইয়া তাঁহার দিব্যপ্রেমী শ্রীশ্রীগিরিধারীর ভজন করিয়া জগতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মহিমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

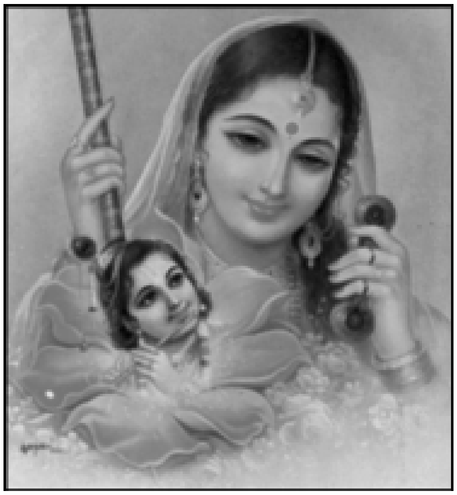

“মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই,
জাকে শির মৌর মুকুট মেরো পতি সোই ॥”—

এই ভজন গীতটিতে দেবী মীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্বন্ধের কথা জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “শোন সকলে, আমি দিবা নিশি যে ময়ূর মুকুটধারী শ্রীগিরিধারীর গুণগানে মত্ত থাকি, সেই গিরিধারী নাগরই আমার নিত্য পতি। তিনি অপর কেউ নন্।”

জীব মাত্রই যে প্রকৃতি তাহা সর্ব্বমান্য সর্ববরেণ্য শ্রীশ্রীগীতা-উপনিষদেই মুনিঋষিগণ ঘোষণা করিয়াছেন—

“অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥” ৭ ।৫ ॥ গীতা ॥

অর্থাৎ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“হে অর্জুন, পূর্বোক্ত পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি ভিন্ন আমার উত্তম প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি অনন্ত জীবরূপে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া আছে।” প্রকৃতি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব উপাসনাতে শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে প্রকৃতি স্বরূপে (মঞ্জরী স্বরূপে) পরম পতি সেবার প্রাধান্যতা প্রচলিত রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে দেবী মীরাবাঈও সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—

“অসুৱন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বেলি বোঈ।
অব তো বেল ফৈল গঈ আনন্দ ফল হোঈ ॥
দুধকী মথনিয়া বড়ে প্রেমসে বিলোঈ।
মাখন জব কাঢ়ি লিয়ো ছাছ পিয়ে কোঈ ॥
ভকতি দেখি রাজী হুই জগৎ দেখি রোঈ ॥
দাসী ‘মীরা’ লাল গিরিধর তারো অব মোহী ॥”

অর্থাৎ—মীরাবাঈ বলিতেছেন, “অন্তরে নয়ন জল সেচন করে যে প্রেমরূপ বেলফুল রোপণ করেছি তা এখন প্রকাশ হয়েছে জগতে। ইহাতে পরমানন্দ ফল হয়েছে আমার। যেমন মিষ্টি ফুলের গন্ধে মন মাতোয়ারা হয়, তেমন আমি ভক্তি-দুগ্ধকে মন্থন করে যখন মধুররস রূপ মাখন তুলে নিলাম, তখন কেউ কেউ অবশিষ্ট ঘোল পান করেন। হিন্দীতে ঘোলকে “ছাছ” বলে। ইহাতে এইরূপ বোঝায় যে দুগ্ধ অমৃত এবং তার সার হচ্ছে মাখন; বাকী অবশিষ্ট আস্বাদ্য অংশ হল ঘোল। তদ্রূপ ভক্তি-দুগ্ধের মাখন একমাত্র “মধুর রস” কান্তাভাবেই সেবন হয়। বাকী সাধারণ শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভক্তিতে ঈশ্বরোপাসনা হল “ঘোল” সদৃশ। তাই পরিশেষে মীরাবাঈ বললেন যে তিনি ভক্তজনের ভক্তিদর্শনে সুখী হন আর ভক্তিহীন জগৎ দেখলে দুঃখে রোদন করেন। অতএব, হে গিরিধারী লাল, তুমি আমাকে (মীরাকে) শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগ রূপ বিরহ সাগর হতে উদ্ধার কর।”—এই ভজন গীতটি হইতে বোধগম্য হয় যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত দেবী মীরাবাঈ শ্রীরাধার মহাভাবে মধুর রসের সাধনাই করিয়া গিয়াছেন।

ভগবতী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহ আস্বাদন করিতেই যেমন

শ্রীচৈতন্যের জগতে আবির্ভাব তেমন মহাত্মা মীরাবাঈও কৃষ্ণ বিরহের দাহনের রাগানুগা ভক্তির যে যে দশায় সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রকাশ তাঁর স্বরচিত একটি ভজন গীতের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।—

“হে রী ম্যায় তো দরদ দিৱানী মেরে দরদ ন জানৈ কোয়।
ঘায়ল কী গতি ঘায়ল জানৈ, জো কোই ঘায়েল হোয় ॥
জৌহরী গতি জৌহরী জানৈ কী জিন জৌহর হোয়।
সূলী উপর সেজ হমারী, কিস্‌বিধ সেবন হোয় ॥
গগন মণ্ডল পর সেঁজ পিয়াকী, কিস বিধ মিলনা হোয়।
দরদ কী মারী বন বন ডোলু, বৈঁদ মিল্যা নেহি কোয় ॥
মীরা কে প্রভু পীর মিটেগী জব বৈঁদ সাঁবলিয়া হোয় ॥”—

কৃষ্ণ বিরহে কাতরা দেবী মীরা বলিতেছেন, “হায় রে! আমি যে কৃষ্ণবিরহ বেদনার পথযাত্রী। আমার সেই ব্যথার বিষয় কেউ (সাধারণ কৃষ্ণপ্রেমবিহীন জন) জানে না, বোঝে না। তা জানবে কেমন করে? বিরহ বেদনা যে কী নিদারুণ! সেই বোঝে যে ব্যক্তি প্রিয় বিরহ ব্যথা পেয়েছে। বিষের জ্বালা যন্ত্রণা সেইজনই জানে যে ব্যক্তিকে বিষধর সর্প দংশন করেছে। বিষের যন্ত্রণা কী ভীষণ অসহনীয় যন্ত্রণা। হে প্রিয়তম! বিরহ শূলের উপর যে আমার শয্যা, তাই নিশ্চিন্তে কেমন করে আমি শয়ন করব? বহু উপরে গগন মণ্ডলে (কূটস্থের গগন মণ্ডলে) রয়েছে আমার প্রিয়তমের শয়ন পালঙ্ক। তাঁর সঙ্গে কেমন করে আমার মিলন হবে? বিরহ বেদনাতে অধীর হয়ে আমি বনে বনে এদিকে ওদিকে নানা স্থানে ছুটাছুটি করে বেড়াই। [শ্রীচৈতন্যদেবও হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করে অধীর হয়ে ছুটে বেড়াতেন।] আমার রোগের চিকিৎসক একজন কাহাকেও পেলাম না। বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমী ভক্তজনের অন্তরের ব্যথা বেদনা অন্যে জানে না এবং বোঝেও না।” ভক্ত শিরোমণি দেবী মীরাবাঈ অবশেষে নিজের জ্বালা-যন্ত্রণার শান্তির উপায় ও চিকিৎসকের নাম নিজেই ঘোষণা করেছেন যে মীরার দুঃখ কষ্ট তখনই মিটে যাবে যখন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর গিরিধারী বৈদ্যরাজের সঙ্গলাভ হবে।

এই কলিকালে স্বয়ং শ্রীহরি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব হরিনাম-রস-মাধুরী নিজে আস্বাদন করিয়া জগদ্বাসীকে তাহা প্রদান করিতে অবতীর্ন হইয়াছিলেন। যিনি জগতে ‘ননীচোর’ নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই বৈরাগী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে পরিচিত। ইনি তাঁহার সর্বস্ব-ধন মোহন মুরলী ও প্রিয়তমা গোপীগণকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন? ইনি মনোহর চাঁচর কেশ মুণ্ডন করিয়া মস্তকে মনোহর টুপী ধারণ করিয়াছিলেন। মা যশোদা বাৎসল্য প্রেমমিশ্রিত রজ্জু দিয়া যাঁহাকে বাঁধিয়াছিলেন সেই নবঘন শ্যামসুন্দরই নবগৌরাঙ্গ রূপে শচীমাতার কোল আলোকিত করিয়া গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ন হইয়াছিলেন, যাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার পীতাম্বর বসনকে জানাইবার জন্যেই বোধহয় তিনি রঙীন গৈরিক বর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সেই গৌরাঙ্গ রূপী শ্রীকৃষ্ণদাসী মীরার মুখে সর্বদা নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারী নাগরই বাস করিতেন। তাই ভক্তিরসে সিক্ত হৃদয়ে দেবী মীরাবাঈ গাহিয়াছেন—

“অব তৌ হরিনাম লৌ লাগী।
সব জগকো ইহ মাখন-চোরা নাম ধর্‌য়ো বৈরাগী ॥
কিত ছোড়ি ৱহ মোহন মুরলী,
কিত ছোড়িঁ সব গোপী।
মূঁড় মুড়াই ডোরি কটি বাঁধি, মাথে মোহন টোপী ॥
মাত যশোমতি মাখন কারন বাঁধে জাকে পাৱ।
শ্যাম কিশোর ভয়ো নব-গৌরা, চৈতন্য জাকো নাঁৱ ॥
পীতাম্বর কো ভাৱ দিখাৱৈ, কটি কোপীন কসৈ।
গৌর-কৃষ্ণ কী দাসী মীরা, রসনা কৃষ্ণ বসৈ ॥”—

তাই কলির জীবের জন্যে অতি সহজ সাধ্য শ্রীহরিনাম যজ্ঞের বিধান করিলেন মীরাবাঈ—“অব তো হরিনাম লৌ লাগী।” কেন না, কলিহত পাপতাপাচ্ছন্ন অজিতেন্দ্রিয় অন্নগত প্রাণচঞ্চল-চিত্ত জীবের পরম কল্যাণের ইহা ভিন্ন উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই। মীরাবাঈ রাজপুতানায় বসিয়া জগৎকে শুনাইয়া আরও বলিয়াছেন যে “জগৎ বিখ্যাত চোর আজ পাকা সাধু বৈরাগী নাম ধারণ করিয়াছেন গো! ইনি রাসেশ্বরী বৃষভানু নন্দিনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী ও অসংখ্য গোপীগণকে কোন দায়ে কোথায় ছেড়ে এসেছেন? কোথায়ই বা কুলনাশা সর্বস্বধন মোহন মুরলীটি ছেড়ে এসেছেন? শ্রীব্রজদেবীগণের কাছে শ্রীকৃষ্ণ এত বেশী ঋণী হয়ে পড়লেন যে দেশান্তরী হয়ে পলায়ন ছাড়া তাঁর আর উপায় নেই! পালিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না তিনি। তাই চোর চূড়ামণি একেবারে তার রঙ ঢঙ সব বদলিয়ে পাকা নৈষ্ঠিক কঠোর সন্ন্যাসী সেজে বসলেন। তাই, “মুড় মুড়াই ডোরী কটি বাঁধি মাথে মোহন টোপী।” কিন্তু এসব করেও রেহাই পেলেন কি? মাতা যশোমতীর পদে মীরা বিশেষ করে জানাচ্ছেন যে ব্রজেশ্বরী মা যশোদা বাৎসল্য প্রীতির মূর্তিস্বরূপে অনাদিকাল থেকে যাকে পুত্ররূপে লালন-পালন করে আসছেন, সেই বিশুদ্ধ সম্বন্ধত্বিকা রতি অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের যে কোন একটির এমনই প্রভাব যে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যকেও পরাভূত করে। রতির নামান্তর হল ভাব। মা যশোদা নিজ গোপজাতির সম্পত্তি মাখন অপচয়কারী শিশুপুত্রকে অনুশাসন দ্বারা শিক্ষা দেবার মানসে দড়ি দিয়ে যাঁকে বেঁধেছিলেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দরই কল্পিত নবগৌরাঙ্গরূপে আবার আবির্ভূত হয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁর প্রাধান নাম। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ হলেও ভক্তের নিকট চিরদিনই বাঁধা। কিন্তু ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত দুর্বল প্রেমের দ্বারা তাঁকে বাঁধতে পারা যায় না। তিনি “পীতাম্বর কো ভাব দিখাবৈ কটি কৌপীন কসৈ”, অর্থাৎ, মীরাবাঈ জগৎবাসীকে জানাইলেন যে পীতাম্বরধারী তাঁর গিরিধারীলালই অরুণাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং এবং “গৌরকৃষ্ণ কী দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ”—দেবী মীরা তাঁর প্রাণের আবেগ ঢালিয়া তাঁর হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে “কৃষ্ণদাসী আমি (মীরা) শ্রীগৌরাঙ্গেরও দাসী। তাই আমার জিহ্বাতে সদাসর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ নামরূপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজিত রয়েছেন।”

অনাদির আদি পুরাণ পুরুষ যিনি, তিনিই কলিতে বৈরাগ্য ধর্ম এবং বিশুদ্ধভক্তিযোগ শিক্ষা দিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। করুণাসাগর সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণে আমরা সকলে শরণাগত হই।

—হরি ওঁ তৎ সৎ—